

যৌথ। এঁটে যাই। -হু.

যদি এটা পেয়ে যাও, ভাঁজ করে ফিরিয়ে দিয়ো।

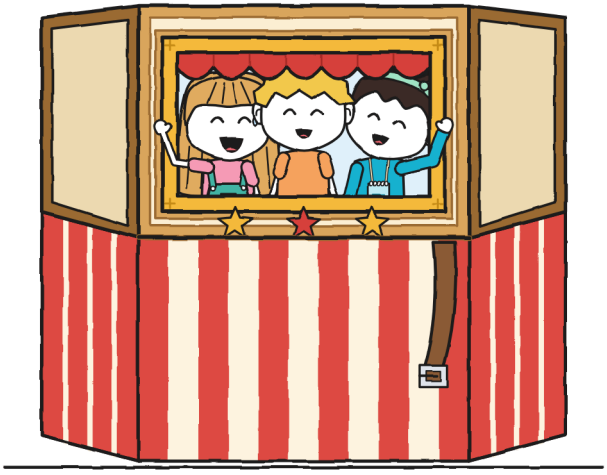
শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায় যা শুধু গল্পে ঘটে: সত্যিকারের ড্রাগন নেই, আর পার্সেল উড়ে ফিরে আসে না। সত্যিকারের স্থানান্তরের জন্য শেষ পাতাটা দেখো। -হু.

অসম্ভব ডেলিভারি · ৬

একটা জায়গা তিনজনের

LinguAula



(গুনির খাতা)

সাইজ XL · সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

অসম্ভব ডেলিভারি · ৬
একটা জায়গা তিনজনের

সিরিজের ষষ্ঠ বই। আগের বইগুলো: “এই পার্সেলটা কামড়ায়”, “মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না”, “ফেরত, দয়া করে”, “এখানে নয়, টুকরো!” আর “একটা কেক দুজনের”।

লেখা ও ছবি: LinguAula

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

সাইজ XL · সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ LinguAula · info@linguaula.com

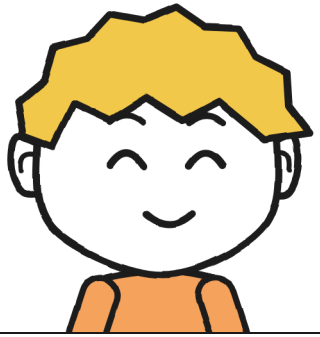
ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

ফন্ট: Andika, Patrick Hand, Caveat, Courier Prime, Atma, Galada ও Hind Siliguri (SIL OFL লাইসেন্স)।

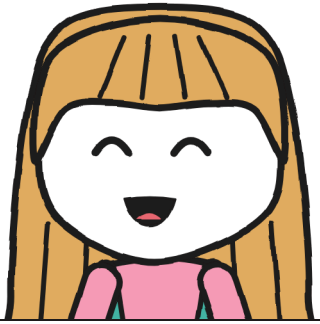
linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এটা তিনজনে বয়। আমি হাতল বেছে নিয়েছি। -হু.

কে কে



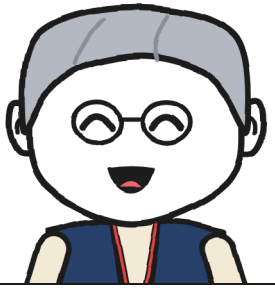
গুনি। মাপে সেন্টিমিটারে। এই সপ্তাহে আরেকটা জিনিসও গোনে।



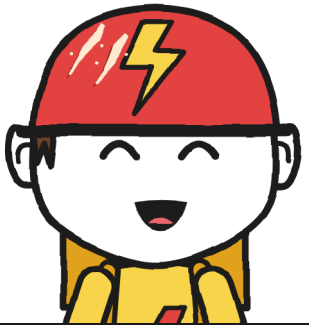
তুলিতা। পথ চেনে। বুঝিয়ে বলাটা অন্য ব্যাপার।



নোয়া। তুলিতার অনেক আগের বন্ধু। মাপে পা ফেলে: পা তো সবসময় সঙ্গেই থাকে।



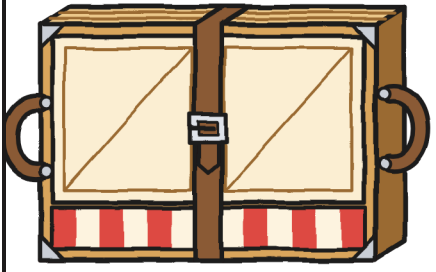
ইরেনে। থিয়েটার ওয়ার্কশপ চালান। কোন দিকে বলেন না: বলেন "থামো"।



তোনিও। বিজলির আর দোকানের। সময় ধরে, মতামত দেয় না। প্রায়।



মারা। পার্সেল ধার দেন। বাক্স্র্টা ছাড়েন না।



৬ নম্বর। একটা থিয়েটার, যা একটা বাক্সে এঁটে যায়। বেল্টটা কেউ না ধরলে যেদিকে খুশি খুলে যায়।



র.

র. প্রেরক। এবার একটা ইনভেন্টরিতে একটা লাইন রেখে গেছেন।



অধ্যায় ১

তিনজন কেন লাগে?

৫ নম্বর খাতাটা শেষ হয়েছে একটা ডায়ালে দুটো কাঁটা দিয়ে, আর আমি ওটা তেমনিই বন্ধ করেছি, কাউকে কাঁটা সরাতে না বলে। শেষ-হওয়া খাতা যেমন রাখো, তেমনই থাকে। এটাই ওদের ভালো দিক: তা নিয়ে আর কেউ তর্ক করতে পারে না।

৬ নম্বরটা কমলা। মান্দারিন-কমলা, তাড়া না থাকলে যেটা এক টানে ছাড়ানো যায়, আর এক কোণে দোকানের সিলমোহরও আছে। মারা ওটা কাউন্টারে গোলাপিটার পাশে রেখে পেছনের ঘরে চলে গেলেন, এমনিতেই সাজানো কয়েকটা বাক্স সাজাতে। মারা খাতা হাতে দেন না: যেদিকে তাকাবে, সেখানে রেখে যান।

প্রথম পাতার জন্য আমার একটা নিয়ম আছে। ২ নম্বরে লিখেছিলাম অফিশিয়াল, ৩ নম্বরে গোপন, ৪ নম্বরে চূড়ান্ত, ৫ নম্বরে শান্ত। তালাওয়ালা চারটে শব্দ, আর চারটেই হুলিতা পড়েছে সবার আগে, আমারও আগে। এবার আমি এমন একটা শব্দ খুঁজলাম, যেটা ব্যাপারটা আগে থেকেই ধরে নেয়।

ওপরে লিখলাম ডেলিভারির খাতা ৬ · গুনির, যেটা লেখারই কথা। তার নিচে, একটাই শব্দ:

যৌথ।

আর অর্ধেক পাতা ফাঁকা রাখলাম, যদি দরকার পড়ে। কীসের দরকার, জানতাম না। একটু পরেই জানলাম: ফাঁকা থাকল না, এক মিনিটও না।

হুলিতা কাউন্টারের ওপাশে ছিল। ও খাতাটা চাইল না; এক আঙুলে টেনে নিল, সবুজ মার্কারের ঢাকনা খুলল, আর অর্ধেক পাতায় এত বড় অক্ষরে লিখল যে তা মার্জিনে পৌঁছে গেল, একটু ভাবল, তারপর মার্জিন ধরেই চলল। তারপর "আমি করিনি" মুখ করে মার্কারের ঢাকনা আটকাল, ওই দোকানে যে মুখটা এখন সবারই।

আমি প্রথম পাতাটা যৌথ করেছি, আমার হাতের লেখা দিয়ে। -হু.

কতটা জায়গা নিয়েছে, মেপে দেখলাম: নিচের অর্ধেকটা, পুরোটা। আমার শব্দটা, চারপাশে যত ফাঁকা রেখেছিলাম তাসহ, ওপরের অর্ধেকটা নিয়েছে। দুই অর্ধেক। ভাগটা আমার বেশ যুক্তিসংগত মনে হলো।



যে আগের খাতাগুলো না পড়েই এই খাতায় এসেছে, তার জন্য, যথারীতি: দোকানটার নাম অসম্ভব ডেলিভারি, মালকিন মারা, যিনি জাদুকরী, মাথায় বেগুনি টুপি, আর যাঁর একটা সিলমোহর আছে, ছাপ দিলেই নেভানো মোমবাতির গন্ধওয়ালা ফুলকি ছিটকে ওঠে। বাঁ দিকের তাকে উনি ফেরত পার্সেল রাখেন, যেগুলো কেউ পৌঁছে দিতে পারেনি, সবগুলো পাঠিয়েছেন র.। যে নেয়, সে যদি লেবেলে মোছে না এমন কালিতে সই না করে, ভোর হলে পার্সেলটা উড়ে নিজের তাকে ফিরে আসে। ছিল কুড়িটা। হুলিতা আর আমি পাঁচটা পৌঁছে দিয়েছি: একটা ড্রাগনের ডিম, পায়ওয়ালা কিছু বীজ, একটা ঘণ্টি, একটা পৌঁছানোর যন্ত্র আর এলিয়ার রুটির দোকানের জন্য একটা স্ট্যান্ড। দেয়ালে, সবুজ অক্ষরে, লেখা বাকি ১৫। বিজলির তোনিওর জায়গা একটা উপুড় করা বাক্সে, টুলগুলোর পাশে। আপাতত।

সোমবার, এলিয়ার চিঠির পরদিন, আমি স্কুল থেকে বেরিয়ে সোজা দোকানে গেলাম। হুলিতা কাউন্টারে হাতে একটা খাম নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ওটা সবুজ ছিল না, নীলও না, যে দুটো খামের রং আমি চিনি। ওটা ছিল ফিরোজা, আর বন্ধ। হুলিতা ওটা দুই আঙুলে, এক কোণা ধরে রেখেছিল, যেন ছ্যাঁকা লাগছে।

"ডাকপিয়ন দিয়ে গেছে। লেখা আছে 'অসম্ভব ডেলিভারি দোকানে'। আমি অনেকক্ষণ খুলিনি।"

“কতক্ষণ?”

“আটাশ মিনিট,” তোনিও ওর বাক্স থেকে ঘড়ি দেখে বলল। “পাড়ার রেকর্ড।”

ও দোকানের ভেতরেও হেলমেট পরে ছিল, তাতে দুটো থাবার আঁচড়, আর ঘড়িটা হাতার বাইরে, যাতে হাতা গোটাতে সময় নষ্ট না হয়।

আমি হুলিতাকে চিনি। ওর হাতে বন্ধ খাম ততক্ষণই বন্ধ থাকে, যতক্ষণে ও ভাঁজটা খুঁজে পায়। আটাশ মিনিট ধৈর্য ছিল না। অন্য কিছু ছিল, আর কী, আমি বুঝলাম না।

ওটা আমার ছিল না। যে খাম আমার নয়, তার ওজন তিনগুণ। -হু.

মারা নখ দিয়ে খামটা খুললেন, দরকারের বেশি কাগজ না ছিঁড়ে। চিঠিটা স্পষ্ট হাতের লেখা, প্রাপ্তবয়স্কের, যে-লেখা লাইনের শেষে বেঁকে যায় না:

“আমি ইরেনে, কমিউনিটি সেন্টারের থিয়েটার ওয়ার্কশপের দায়িত্বে। ইনভেন্টরি হালনাগাদ করতে গিয়ে একটা লাইন পেয়েছি: ‘ভাঁজ-করা ছোট থিয়েটার: পাওয়া মুলতুবি’। ওটা কি আপনাদের কাছে আছে? শনিবার ৩১ তারিখে পাড়ার প্রতিযোগিতা। ছোট থিয়েটারটা যদি ভাঁজ করা অবস্থায় আমাদের উঠোনে পৌঁছায়, তিনজনের একটা দল বয়ে আনলে, আমি সেখানেই সই করব। নোয়ার দলে তিনজনের জায়গা আছে, আর আপাতত শুধু ও-ই আছে।”

তার নিচে, অন্য হাতের লেখায়, ছোট আর সোজা, ফিরোজা কালিতে:

“হুলিতা: আমি! এখন থিয়েটার করি। এমন কাউকে সঙ্গে এনো, যে পার্সেল বোঝে। —নোয়া”

হুলিতা নামটা পড়ল, আর ওর ঠোঁট এক দিকে উঠে গেল, শুধু এক দিকে, যেমন হয় কিছু মনে পড়লে, যেটা বলবে না। ও আস্তে “নোয়া” বলল, যেভাবে হাজারবার পেরোনো কোনো রাস্তার নাম বলে মানুষ।

“এমন কাউকে, যে পার্সেল বোঝে।” সেটা আমি। “পার্সেল” কথাটা আমার ভালো লাগল। “কাউকে” কথাটা কম।

পাঁচটায় ওরা দুজন এল।

ইরেনের হাতে একটা ফাইল, গায়ে অনেক পকেটওয়ালা নেভি-ব্লু ডেস্ট, আর গলায় ঝোলানো একটা হুইসেল। ছোট করে ছাঁটা ধূসর চুল, গোল চশমা, আর তা দিয়ে উনি তাক ধরে ধরে পুরো দোকানটা দেখলেন, যেন কেউ না বললেও ইনভেন্টরি করছেন। নোয়ার গলায় দড়িতে ঝোলানো একটা নোটবই, আর কানের পেছনে একটা ফিরোজা পেনসিল। চুল উঁচু খোঁপায় কোঁকড়া, একটা পুদিনা-সবুজ স্কার্ফে বাঁধা; সোয়েটার ফিরোজা, খামের মতো। ওর সবকিছু মনে হচ্ছিল খুঁজতে না হয় বলে নিজের জায়গায় রাখা।

হুলিতা কাউন্টারের পেছন থেকে বেরোল, ঝাঁপ না খুলে, নিচ দিয়ে, আর ওরা জড়াজড়ি করল। এত বেশি সময় জড়াজড়ি করল যে আমি মেপে নিলাম: এগারো সেকেন্ড। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম, খাতা হাতে। খাতা এর জন্যও কাজে লাগে: হাতে কিছু রাখার জন্য।

“এ গুনি,” হুলিতা বলল। “পার্সেল বোঝে।”

“হ্যালো, পার্সেল-বোঝা গুনি,” নোয়া বলল। আর ওর নোটবইয়ে আমার নামটা লিখে নিল।

পুরো নামটাই লিখল, ওই উপাধিসহ, যেটা ও এইমাত্র আমাকে দিয়েছে। যেখান থেকে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, দেখলাম, আমি পাতার দ্বিতীয় লাইন। প্রথমটায় লেখা “হুলিতা”, আর তার নিচে একটা দাগ, যেমন দেওয়া হয় যা হয়ে গেছে তার নিচে।

মারা নীল টুলে উঠে তাক থেকে ৬ নম্বরটা নামালেন। সবগুলোর মতোই একটা বাক্স, বড়ও না, ছোটও না। লেবেলে টাইপ করা পাঁচটা লাইন: নং ৬. উঠোনের ওয়ার্কশপ. দুই দরজা দিয়ে প্রবেশ. ভাঁজ করা অবস্থায় পৌঁছে দিন. আর নিচে, যথারীতি, প্রেরক: র.। চারপাশে ফেরত-এর নয়টা সিলমোহর।

“নয়টা সিলমোহর,” হুলিতা বলল।



“‘দুই দরজা’,” নোয়া পড়ল। “কোন দুটো দরজা?”

ইরেনে জানতেন না। মারাও না। আমি একটা প্রশ্নচিহ্ন দিয়ে লিখে রাখলাম, যেটা আমি লিখি যখন কিছু জানি না আর চাই যে লেখা থাকুক, আমি খেয়াল করেছি।

“আমি ওটা নয়বার নিয়ে গেছি,” মারা বললেন। “সোমবারে আমাকে ডাকত সেলাই। বুধবারে, কোরাস। শুক্রবারে, দাবা। ‘ওয়ার্কশপ? এখানে নয়।’ একটা ওয়ার্কশপের জন্য কেউ সই করত না।”

ওঁর কথা বলতে বলতেই আমি এঁকে ফেললাম, তিনটে ঘরে: মারা, বাক্স বগলে, একই দরজার সামনে, আর দরজায়, পালা করে, সুতো-সুঁই, একটা সুরের চিহ্ন আর একটা দাবার ঘোড়া, যেটা কিছু বলছিল না, কারণ দাবায় চুপ করে থাকতে হয়। নিচে, ভোরবেলা দোকানের জানালা দিয়ে বাক্সটা ঢুকছে। নয়বার।

“থিয়েটার মহড়া দেয় উঠোনে,” ইরেনে বললেন। “আর উঠোনে কোনো ঘণ্টি নেই।”

উনি ফাইল খুলে মারাকে সেন্টারের সিল দেওয়া একটা কাগজ দেখালেন। মারা কাগজটা নাক খুব কাছে এনে পড়লেন, যেভাবে উনি পড়েন যা গুরুত্ব দিয়ে নেবেন ঠিক করেছেন।

"এখন রেজিস্টারে আছে: 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ। দায়িত্বে: ইরেনে'। একটা ওয়ার্কশপের জন্য এখন কেউ সই করে।"

"এখন যখন সই করার লোক আছে, মারা ওটা নিজের বাক্সের ভেতরে করে নিয়ে যান না কেন, এলিয়ার স্ট্যান্ডের মতো?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

"আমার বাক্সে আমি ওটা নয়বার নিয়ে গেছি," মারা বললেন। "এখন শর্ত ঠিক করবেন যিনি পার্সেল গ্রহণ করছেন।"

"ভাঁজ-করা ছোট থিয়েটার তো চত্বরে চত্বরে নিয়ে যাওয়ার জন্য," ইরেনে বললেন। "আমি দেখতে চাই, আমার ছেলেমেয়েরা ওটা নিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে পারে কি না। না পারলে, ওটা আমার কাজে লাগবে না। আর যা আমার কাজে লাগে না, তাতে আমি সই করি না।"

"এটা আমি আগেও শুনেছি, একটা বেকারিতে," মারা বললেন।

আমার একটা প্রশ্ন ছিল, চিঠিটা পড়ার পর থেকেই, আর ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই করে ফেললাম।

"আর তিনজন কেন লাগে?"

আমি সত্যিই জিজ্ঞেস করেছিলাম। দুটো হাতলওয়ালা একটা বোঝা; দুজন মানুষ, প্রতি হাতলে একজন। আঙুলে গুনে দেখেছিলাম, দুজনই হয়।

কেউ হাসল না। ইরেনে আমার দিকে চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন, যেভাবে তাকায় মানুষ এমন একটা টুকরোর দিকে, যেটা যতটা মনে হয়েছিল তার চেয়ে ভালো এঁটে যায়।

"ভালো প্রশ্ন। মঙ্গলবার, উঠোনে, তোমরাই আমাকে উত্তর দেবে।"

মারা নিজের বই খুলে নিজের শর্তগুলো লিখলেন। মারার শর্ত সবসময় এক হাতে এঁটে যায়; আমি নিজের হাত দিয়ে গুনলাম, বুড়ো আঙুলটা বাড়তি রইল:

- ৬ নম্বর: মহড়ার জন্য ধার দেওয়া।
- ইরেনের সঙ্গে বা আমার সঙ্গে বেরোবে।
- ভাঁজ করা অবস্থায় ফিরবে।
- এখানে ঘুমোবে।

লেবেল থাকবে বাক্সে, আর বাক্স মারার কাছে।

ও যদি নিজের তাকেই ঘুমোয়, ভোরে ফিরে যাওয়ার মতো কোথাও থাকে না। তাই নয়টা সিলমোহরেই থেকে যায়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। -হু.



মঙ্গলবার আমরা কমিউনিটি সেন্টারের উঠোনে গেলাম। ফুটপাত থেকে ঢুকতে হয় একটা লোহার ফটক দিয়ে, যাতে রঙের অনেক স্তর, আর যেটা নিজে থেকে বন্ধ হয়: ছেড়ে দিলে আস্তে আস্তে ফিরে আসে, ক্লিক করে লাগা পর্যন্ত, যেন একটা কুকুর, যে না বলতেই বসে পড়ে।

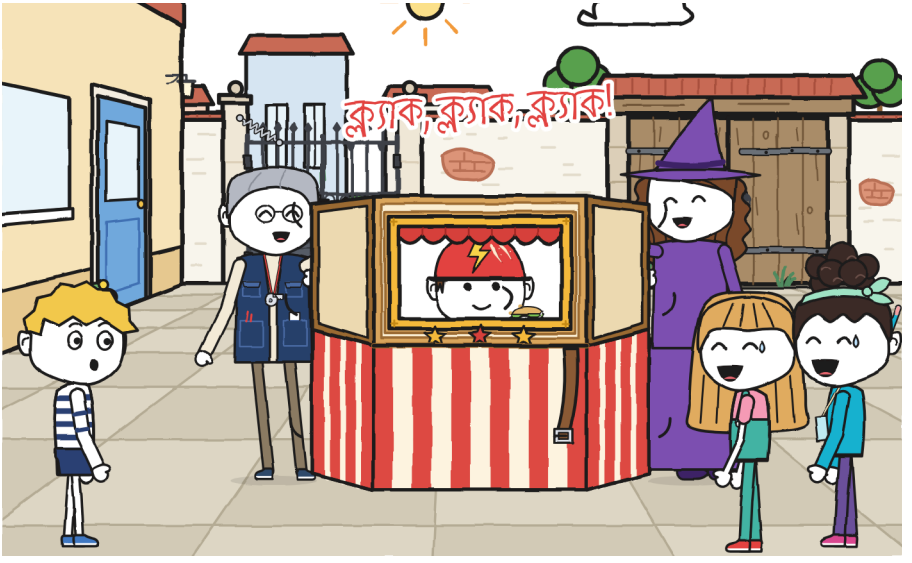
মারা বাক্সটা মাটিতে রেখে ঢাকনা খুললেন। বেরোতেই ছোট থিয়েটারটা বড় হয়ে উঠল, এলিয়ার স্ট্যান্ডের মতো। আমি আর ভয় পাই না: ফিতে বের করি।

বন্ধ অবস্থায় ওটা ছিল কাঠের প্যানেল আর কাপড়ের একটা চ্যাপ্টা বোঝা, দু পাশে একটা করে হাতল, আর একটা বেল্ট, যেটা তিন ফুটোর একটা বকলসের ভেতর দিয়ে গেছে। এক মিটার বাই সত্তর সেন্টিমিটার, আর কাত করলে একটা বিঘত। ফটকের একটা পাল্লা খোলা থাকলে, নব্বই সেন্টিমিটার। কাত করে ধরলে ফটক দিয়ে ঢুকে যেত। সেটাই ছিল সহজ কাজ।

সবার আগে ইরেনে দেখতে চাইলেন ওটা আস্ত আছে কি না। বেল্ট খুলে বোঝাটা ঘোরালেন। প্যানেলগুলো নিজের ওজনে নিজে থেকে খুলে গেল, একটার পর একটা:

ক্‌ল্‌যাক, ক্‌ল্‌যাক, ক্‌ল্‌যাক। তিন দেয়ালের একটা মঞ্চ, একটা ছোট পর্দা, আর পেছনের প্‌যানেলে ফ্রেমওয়ালা একটা জানালা।

জানালা দিয়ে তোনিওকে দেখা যাচ্ছিল, ফুটপাত দিয়ে একটা স্‌যান্ডউইচ নিয়ে যাচ্ছে। মুখ ভর্তি ছিল। অভিবাদন জানাতে পারল না। একটু থমকে দাঁড়িয়ে রইল, ফ্রেমে বাঁধা, হেলমেট মাথায়, একটা গাল আরেকটার চেয়ে ফোলা, যেন খাওয়ার সময় আঁকা কোনো গণ্‌যমান্‌য মানুষের ছবি।



“আস্ত আছে,” ইরেনে বললেন। “ওয়ার্কশপের নিয়ম: হাত হাতলে। কবজায় কখনও নয়। আর বাঁকে, কেউ একজন বেল্টটা ধরবে।”

আমি ঠিক তা-ই লিখে রাখলাম।

ইরেনে আর মারা ছোট থিয়েটারটা ভাঁজ করে বেল্ট আটকালেন।

“আমরা পরীক্ষা করি,” হুলিতা বলল। নোয়া তখনই অন্‌য হাতলে।

ঠিক করার জন্য ওরা একে অন্যের দিকে তাকাল না। বলল না পর্যন্ত: প্রত্যেকে নিজের দিকে গেল, যেমন যায় মানুষ নিজের চেনা চেয়ারে।

ওরা তিন গুনে ওটা তুলল। পারল। উঠোনে একপাক ঘুরল, আস্তে, কনুই একটু ছড়িয়ে, আর ছোট থিয়েটারটা দুজনের মাঝখানে দুলল না, যেন একটা ঠিকঠাক বওয়া ট্রে। ওরা ফটক পর্যন্ত পৌঁছাল। ফটকটা বন্ধ ছিল।

হুলিতা ওটার দিকে তাকাল। নোয়া তাকাল। ওদের চারটে হাত, আর চারটেই ব্যস্ত।

আমি দুই মিটার দূরে, আমার দুটো হাতই খালি, আর একটা খাতা।

ইরেনে, পেছনে, ফাইল বুকে চেপে, কিছু বললেন না। "ওদের সাহায্য করো" না, "তুমি" না।

আমি পিঠ দিয়ে ফটকটা ধরে রাখলাম। ওরা পেরোল। ইরেনে ফাইলে কিছু একটা লিখলেন।



সেই বিকেলে আমি এই খাতার যন্ত্রটা বানালাম। আমার কর্মজীবনে এটা পঞ্চম, কাঁপুনি-মিটার, লাল-মিটার, এখানে-মিটার আর হইচই-মিটারের পর, আর প্রথম, যেটা একজন মানুষকে মাপে না, একসঙ্গে কয়েকজনকে মাপে। নাম দিলাম তিনজনের মিটার, "প্রতিটা অংশে কে কী করে"। প্রতি অংশে একটা সারি আর তিনটে ঘর, প্রত্যেকটায় একটা ছোট ছবি:

- বওয়া: দুই হাত, দুই হাতলে।
- দিক দেখানো: কোন দিক দিয়ে আর কখন, বলা।
- পথ করে দেওয়া: দরজা, ফুটপাতের ধাপ, মানুষ।

প্রথম সারিতে, "উঠোন, প্রথম চেষ্টা", আমি লিখলাম "হুলিতা আর নোয়া", "হুলিতা আর নোয়া" আর একটা ফাঁকা ঘর। দ্বিতীয়তে, "উঠোন, দ্বিতীয় চেষ্টা", একই, কিন্তু তৃতীয় ঘরে লিখলাম "গুনি"।

দুটো নাম বারবার আর একটা ঘর ফাঁকা: পার হওয়া যাবে না। ঘরটা ভরা থাকলে, যাবে। ইরেনের জন্য উত্তরটা আমার কাছে ছিল, আর সেটা আমার নিজের।

আর আরেকটা জিনিসও লিখে রাখলাম, আরও ছোট: "ফটক একটা পাথরও ধরে রাখতে পারে"।

আমি ওটা লিখলাম পেনসিল প্রায় না চেপে।



লেবেলটা বোঝা বাকি ছিল।

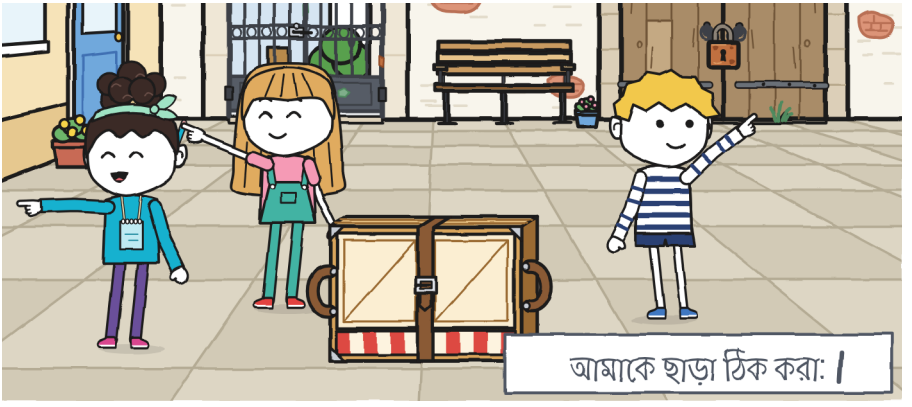
"দুই দরজা মানে ফটকের দুটো পাল্লা," হুলিতা বলল।

"দুটোই খুলতে হবে," নোয়া বলল।

"আগে বাইরে থেকে পাঁচিলটা মেপে দেখতে পারি," আমি বললাম।

আমরা তিনজন একসঙ্গে আঙুল দেখালাম। হুলিতা, ফটক। নোয়া, ওয়ার্কশপের ঘর। আমি, রাস্তা।

"পরে," ওরা দুজন বলল।



ওরা একসঙ্গে বলল, একই সুরে, যেন মহড়া দিয়েছে। মহড়া দিয়েছিলই, আমার মনে হয়। বছরের পর বছর ধরে।

আমি একাই গেলাম। ফটক দিয়ে বেরোলাম, যেটা পেছনে ক্লিক করে বন্ধ হলো, আর ফিতে দিয়ে মাপতে মাপতে পাঁচিল ঘুরলাম, অংশে অংশে, হাঁটুতে খাতা রেখে প্রতিটা সংখ্যা লিখে। পাঁচিলটা লম্বা, আর একটা সরু গলিতে গিয়ে মিশেছে, যেখানে স্থির জলের গন্ধ। আর সেখানে, মোড়ের ওপাশে, আমি একটা জিনিস পেলাম।

আমি তাড়াতাড়ি ফিরলাম, মাথায় সেই জিনিসটা নিয়ে, ফিতেটা তখনও গুটোনো হয়নি, ফুটপাতে এক মিটার হলুদ টেনে। ঢুকে দেখি, হুলিতা আর নোয়া এমন কিছু নিয়ে হাসছে, যা ঘটেছিল আমি পাড়ায় আসার আগে। ওরা কাঁধ দিয়ে হাসছিল, শব্দ না করে, আর নোয়া হুলিতার হাত ছুঁয়ে ওকে থামাতে চাইছিল, আর হুলিতা থামছিল না।

আমি মুখ খুললাম।

“ঠিক হয়ে গেছে, গুনি,” হুলিতা বলল। “দুটো পাল্লা।”

পাতার নিচের কোণে, ছোট করে, পেনসিলে, আমি লিখলাম: আমাকে ছাড়া ঠিক করা। আর পাশে, একটা দাগ। মুখ খোলা অবস্থাতেই ওটা লিখলাম।

আমি মুখ বন্ধ করলাম। আর খাতাও।

ওই দাগটা আমি দুদিন পরে দেখেছি। ওটা আমার ছিল। -হু.

একটা গল্প, ছয় সাইজ

এই বইটা ছয়টা সাইজে আছে, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ২০টিরও বেশি ভাষায়। XXS, XS, S, M আর L একই ছবি নিয়ে পাতায় পাতায় গল্পটা বলে, প্রতিবার আরও একটু সূক্ষ্মতা নিয়ে; XL হলো উপন্যাস: একই গল্প, যেখানে গুনি যা ভাবে অথচ বলে না, তার সবকিছুর জন্য জায়গা আছে।

CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক: XXS, pre-A1 · XS, A1 · S, A2 · M, B1 · L, B2 · XL, B2–C1।

যে যার সাইজে। একই ছোট থিয়েটার। -হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো (L সাইজের অ্যাক্টিভিটিসহ)